রবীন্দ্রসংগীত ঃ এক অনন্য স্থাপত্য ও রূপময় উপকথা

বটকৃষ্ণ দে

অনুরাগ নিশ্চয়ই ছিল, আছেও। কিন্তু মার্গ-সংগীতের বিভিন্ন রাগরাগিনীর ব্যাকরণিক স্বর-বিন্যাস এবং সুরবিস্তারে আমার তেমন জ্ঞানগম্যি নেই, অথচ কুশলী কলাকারদের কণ্ঠে খেয়াল - ঠুংরির সুর-বাহার, সূক্ষ্ম কারুকার্য, স্বর-প্রক্ষেপী ভঙ্গিমার অমেয় মাধুর্য আমার বেশ ভালোই লাগত, এখনো লাগে। বোঝা-না-বোঝার এক অধরা রহস্যময়তাই বোধকরি আমার গান ভালোবাসার গোপন কথা। ছোটবেলা থেকে আমি সংগীত প্রেমী, আর আমার মধ্যে এই সংগীতপ্রেমকে, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত, জিইয়ে রাখায় সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা যার, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যের বাক্-বৈদগ্ধ্য, তাঁর গানের কথার বিমূর্ত রূপময়তা, সুরের ললিত লাবণ্য, রাগ-রাগিনীর ব্যবহারের বিচিত্র মাধুর্য - জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে না বুঝেও মনের গহন কোণে এমন অশ্রুতপূর্ব অনুরণন তুলত যে রবীন্দ্রসংগীত আমার দ্বিতীয় ধর্মের রূপ নিয়েছিল। রবিঠাকুরের গান সারা বাঙালির ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে গেছে। গীতিবিতান সেই গ্রন্থ, যেখানে জীবনের সমস্ত অস্তিত্ব নিহিত — জন্মমৃত্যুর সব মুহূর্তের, মানুষের সব অনুভূতির গ্রন্থনা সেখানে। পৃথিবীতে, প্রকৃতিতে যত সুর, যত স্বর, যত তাল-লয়-ছন্দ, প্রত্যূষ থেকে প্রদোষ পর্যন্ত আকাশে যত রঙ, সমুদ্রের হৃদয়ে যত উথাল-পাতাল আকুলতা, শ্রাবণ-ধারায় যে অবিরাম রুমঝুম, ফাল্গুনে মধুপের যে গুনগুন — সব কিছু রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গীতবিতানে। রবীন্দ্রসংগীতকে আমি পেয়েছি আধ্যাত্মিক জীবনবেদের মর্মকথা হিসেবে, আত্মার পরম রূপে।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির জীবনের পথ-চারণা এবং রবীন্দ্র-সৌরবিশ্বের ভাস্বরতম তারকা রবীন্দ্রসংগীত। এই গানই রবীন্দ্রনাথকে নন্দিত ও বন্দিত করে রেখেছে। রবীন্দ্র-কাব্যের গভীর গাম্ভীর্য, আধ্যাত্মিকতা, সুখ-দুঃখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির অভিব্যক্তি, তার নান্দনিক আভিজাত্য সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তাঁর অন্য সব সাহিত্যকৃতি — তা সে গল্প-উপন্যাসই হোক কি নাটক-নৃত্যনাট্য অথবা ভ্রমণকাহিনী কি স্মৃতিচারণ - সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা, অনুশীলন ও পরিশীলনের প্রয়োজন। এই মন, এই মনন ক'জনের আছে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান সর্বজন প্রিয়। কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন ঃ

'রবীন্দ্রনাথ যদি জীবনে তাঁর গানগুলি ছাড়া আর কিছু নাও লিখতেন, তাহলেও শুধুমাত্র ওই গানগুলির জন্যই তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা যুগে যুগে কালে কালে কীর্তিত হতো। কবি রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বুঝবার পক্ষে তাঁর গানগুলিই যথেষ্ট। তাঁকে বুঝতে আর কিছুর দরকার পড়ে না।'

একথা কিছুটা বিস্ময়ের হলেও, তা স্বীকার করতেই হয় যে এই রবীন্দ্রসংগীতও কোন-কোন বাঙালি মহলে - এবং তাদের সংখ্যা মোটেই নগণ্য বলা চলে না - এককালে তেমন করে গ্রাহ্য ছিল না। তাঁর গানকে অনেকে মেয়েলি, কৃত্রিম, শান্তিনিকেতনী-মার্কা বিশেষ-ঢং-ভর্তি, একঘেয়ে ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করত। এ-ও বেশ আশ্চর্যের যে এদেরই মধ্যে কেউ কেউ কিংবা অনেকে, কঠিনতর হলেও, রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য পছন্দ করত, কিন্তু গান? সেটা না-পছন্দ্! সঙ্গে-সঙ্গে একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রগীতানুরাগীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পাওয়া যাবে যারা রবীন্দ্রসংস্কৃতি ভিত্তিক অভিজাত সমাজে নাম লেখাতে তাঁর গানের স্তুতিতে উচ্চকণ্ঠ হত। এরা নিঃসন্দেহে নকল-ভক্ত (pseudo)। কিন্তু সত্যিকারের রবীন্দ্রানুরাগীর কাছে রবীন্দ্রসংগীতই বাংলা গানের শেষ কথা। তারপর deluge! এটাও সন্দেহাতীতভাবে, অতিকথন। তবে, এটুকু না বললে প্রসংঙ্গটা অসম্পূর্ণ থাকবে যে অধুনা রবীন্দ্রসংগীত-রসিক মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। তাঁর গান জনপ্রিয়তায় প্রায় সর্বব্যাপী, সমাজের সকল স্তরেই সমান প্রসারী। মজার ব্যাপার, আজকাল প্রায়ই দেখছি, অন্য ধারার সংগীত শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথের গান সব অনুষ্ঠানে পরিবেশন করছে, 'অ্যালবাম' বানাচ্ছে, সিনেমায় টিভি সিরিয়্যালে মঞ্চে আধুনিক গানের পরিবর্তে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হচ্ছে — এমন কি 'জীবনমুখী' ও 'বাংলা ব্যাণ্ড'-মার্গীরাও রবীন্দ্রসংগীতের ভিডিও ক্যাসেট-সি.ডি তৈরি

করছে। কিছুকাল হল, ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যেও একটা অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে - তারা, তা সে ওড়িশী হোক (সোনাল মানসিং) কি ভরতনাট্যম (যামিনী কৃষ্ণমূর্তি) - রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আপন-আপন শৈলীতে নৃত্য-নির্মাণ করে মঞ্চে উপস্থাপনা করছেন। এই তো, সেদিন সুদূর আমেরিকার লস এঞ্জেলেশ-এ অনুষ্ঠিত 'আনন্দ উৎসবে' বিশ্বখ্যাত সরোদশিল্পী আমজাদ আলি খান সরোদে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' এবং আরো কিছু রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন। আগেও তিনি করেছেন - (রবিশংকরও করেছেন তাঁর সেতারে) রবীন্দ্র সংগীতের অর্কেস্ট্রার ক্যাসেট তো বাজারে বলতে গেলে 'হিট'।

এ সবের অর্থই হল, রবীন্দ্র সংগীতের জনপ্রিয়তা প্রায় শিখরে পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রজন্মের সার্ধশতবর্ষে দাঁড়িয়ে এমনটি আশা করা অসমীচীন হবে না যে আজি হতে শতবর্ষ পরেও তাঁর গান ঘরে ঘরে এমনিভাবে, হয়তো বা আরো বেশি করে গুঞ্জিত হবে!

রবীন্দ্রনাথের গানে কী সেই যাদু, কী সেই সম্মোহনী আকর্ষণী শক্তি যা না কি শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন উঁচু-নিচু, সমাজের সব স্তরের মানুষকেই, এবং সব বয়সেই, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছে, তার বিচারের ভার বিদ্বৎজনের পণ্ডিত ও ওস্তাদদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা, আম্-আদমিরা, আমাদের ভালো লাগে বলেই শুনে যেতে চাই। সংগীতের যাদুকর হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট কেমন ছিল? কোন্ সেই সাংগীতিক পরিবেশ? তৎকালীন বাংলা গানের কেমন ধারা পরিমণ্ডল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কেমন আবহাওয়া — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকে, নতুন বাংলা গানের পথিকৃৎ, প্রবাদপুরুষ, যুগ-নায়ক, গুরুদেব তৈরি করল, সে সম্পর্কে কৌতূহল মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বরং গানের তাঁর গুণের বিশ্লেষণী আলোচনায় সেই পূর্বকথন খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তাঁর নিজস্ব প্রতিভা তো স্বতঃসিদ্ধই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অনেক জ্ঞানী-গুণী সংগীতজ্ঞের সমাবেশ ছিল। সেখানে শাস্ত্রীয় সংগীতের যেমন চর্চা ছিল, তেমনি ছিল পদাবলী ও পালাকীর্তনের (যদুভট্ট ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর) কাছে রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের তালিমও নিয়েছিলেন, যা তাঁকে পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত গান রচনায় সহায়তা করেছিল। সে সময়, নিধুবাবুর টপ্পা এবং তাঁরই সমকালীন কালি মির্জার গানও বাংলা সংগীত মহলে বহুল প্রচলিত ছিল। দেশীয় রাজা ও জমিদারদের দরবারে হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতের ওস্তাদদেরও খুব কদর ছিল। আর সংগীতাভিলাষী অনেকে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংগীতশিক্ষায় ব্রতী হত। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর, উপাসনার অঙ্গ হিসেবে মন্দিরে এক বিশেষ ধরনের ধ্রুপদাঙ্গের সংগীত রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ('ব্রহ্মসংগীত' নামটি তাঁরই দেওয়া)। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ধ্রুপদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। দাশরথি রায়ের মার্জিত রুচির পাঁচালি, কবিয়ালদের মধ্যে রাম বসুর কবিগান, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঁধা যাত্রাপালার প্রবর্তন*, মধুসূদন কিন্নর (বা মধুকান) প্রবর্তিত 'ঢপ কীর্তন' এবং হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭) এসব প্রবহমান সংগীতধারা রবীন্দ্রপূর্ব পর্বে বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আর ছিল, তদানীন্তন নাটকে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী সংগীত। বলাই বাহুল্য, এই সব সংগীত-শ্রেণীর সৌকর্য, কাব্যিক ও সাংগীতিক উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই উদারপ্রসারী সংগীত-পরিমণ্ডলে মানুষ-হওয়া রবীন্দ্রনাথের গান রচনা শুরু হয়েছিল বারো-তেরো বছর বয়সেই। গুরু নানকের একটি ভজন 'গগন মে থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে'-র অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বালে' (১৮৭৩ সালে, যখন তাঁর বয়স বারো)**। এর পরেই, চৌদ্দ বছর বয়সে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য রবি-কবি গান লিখলেন ঃ 'জ্বলজ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।' এবং 'সঞ্জীবনী সভার', জন্য লিখেছিলেন 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি প্রাণ' এবং 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' (১৮৭৭ সালে)। ওই বছরই লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা।'

ভাবা যায়, এইটুকুন বয়সেই 'গীতগোবিন্দ'র সুর বেজেছিল তার মনে? 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তার ছায়া এসে পড়ল — তাই একদিন যখন হঠাৎ 'আকাশ-ভাঙা মেঘ গর্জে উঠে', 'বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়', তার শব্দধ্বনি ঝংকার করে ওঠে ঃ 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। আমরা সবাই জানি, 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও সুরের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ক্রমে তাঁর ভাবধারা আরো গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছে গিয়ে রচিত

---

*এই পালা রচয়িতাদের মধ্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং মতিলাল রায়। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' পালার সহজ-সরল সুরের রাগভিত্তিক গানগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চে সংগীত প্রবর্তনে প্রাণিত করেছিল। 'থিয়েটারী গান' নামে উচ্চাঙ্গ রাগাশ্রিত ও তালে নিবদ্ধ এক বিশেষ শ্রেণীর গান সে সময়ে সাংগীতিক কৌলিন্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

**এই গানটির রচয়িতা ও রচনাকাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে সংশয় আছে)।

হল কীর্তনাঙ্গের বেশ কিছু সংখ্যক অনবদ্য সংগীত - যে সৃষ্টিতে ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে, অলংকার নয়।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনি মূলত দেশীয় সুরই বেশি ব্যবহার করেছেন, যেমন রাগসংগীত, লোকসংগীত, কীর্তন, বাউল এবং আঞ্চলিক সংগীতের সুর-ও আঙ্গিক, হিন্দি-ভাঙ্গা গানের অনুসরণে অন্তত ৪০টি গানের নাম করা যায়, তাছাড়া কর্ণাটকী সংগীত-সুরের ও গায়কীর প্রত্যক্ষ প্রভাবও তাঁর কিছু সংখ্যক গানে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতনী উপাদানগুলি রবিঠাকুরের গানের উল্লেখ উপজীব্য হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু বিভিন্ন সংস্কৃতির মূল্যাদর্শের আদানপ্রদান ও সমন্বয়ে বিশেষরূপে আস্থাবান ছিলেন, তাই সংগীতে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপন সংগীতসৃষ্টিকে ঋদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী সুর ও আঙ্গিকের আমদানিতে তাঁর তেমন অনীহা ছিল না, যদিও এসব কৃতির সার্থকতা ছিল, নিজ প্রতিভার মাধ্যমে, তাঁর আত্মীকরণে। এক কথায়, নানান প্রভাবের কাব্যভাব ও সংগীতাঙ্গিক এমনভাবে তাঁর সৃষ্টিতে অভিমূর্ত হয়েছিল যে তারা যে রবীন্দ্র-সর্বস্ব, রবীন্দ্র নিজস্ব বাংলা গান নয়, তা ভাবাই যায় না। তাঁর সব গানের অবয়ব ও আত্মা তাঁরই। তাঁরই কৃষ্টিভাবনা, সৃষ্টি সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। সত্যি বলতে কী, গানের ক্ষেত্রে, সর্বাঙ্গীণ দিক থেকে ভালো লাগা, মন্দলাগাটাই আসল, গবেষক সমালোচকদের চুলচেরা বিচার, কিংবা অতি-পণ্ডিতদের অনৈতিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষণ সাধারণ শ্রোতার কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, আম খেতে এসেছো আম খেয়ে যাও, গাছের সংখ্যা বা কটা ডাল কি পাতা, সেসব গুণে কি হবে, সেই হিসেবে কী লাভ?

আমার সংগীত-জগতের সঙ্গে ষাট বছরেরও বেশি যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি কী অনন্যতায় ভাস্বর, কত কারুকার্যময় রবিঠাকুরের সংগীত ভাস্কর্য, কত বিচিত্রতায় চিত্রিত তাঁর সৃষ্টিশৈলী - তিনি একাই সমস্ত বঙ্গসংস্কৃতিকে নতুন উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন, ভারতীয় কৃষ্টির সমাহারে! আমার এই ভাবনার পক্ষে দু'চারটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ বিবৃত করা যেতে পারে!

ক) রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাগ সংগীতের সুর ও শৈলী (যেমন, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি) অবলম্বন করে প্রচুর গান লিখেছেন, যেখানে রাগসংগীতের সুররাগিনী ও আঙ্গিকগত মাধুর্য তাঁর আপন কাব্য ভাবনা, মনন, রূপচেতনায়, তাদের ঋদ্ধ করেছেন। সৃষ্টির সৌন্দর্য সাধনই ছিল গুরুদেবের একমাত্র লক্ষ, তাই প্রয়োজনে রাগ ভেঙ্গে ওই ভাঙা সুর তিনি গানে প্রযুক্ত করেছেন, কখনো হিন্দুস্থানী রাগরীতির অনুসরণেও গান বেঁধেছেন। কবির এ পর্যায়ের গানের মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গের পূজা পর্বের গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন, 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন', 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', 'হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে', 'কে যায় অমৃত ধামযাত্রী', 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে', 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা' ইত্যাদি।

ধামার প্রকৃতির গান হিসেবে 'সুধা সাগর তীরে', 'নতুন প্রাণ দাও' অবিস্মরণীয়। তাঁর বেশ কিছু গানে শোরী মিঞার টপ্পার প্রভাব লক্ষ্যণীয় - 'এ পরবাসে রবে কে', 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে।' খেয়াল প্রকৃতির গানের মধ্যে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে', 'কী গাব আমি কী শুনাব' 'জীবনে আমার যত আনন্দ', বিখ্যাত লোকসংগীতের সুর নিয়ে তাঁর মতো পরীক্ষা-নীরিক্ষা আর কে করেছে? তিনি বহুবার বলেছেন ঃ 'লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোন দেশে আছে কি না জানিনে।' 'বাউল' এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'ভাটিয়ালী'র রস-সম্পৃক্ত নির্যাসটুকু তিনি তাঁর সংগীতের রসভাবের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এক আশ্চর্যমধুর সুখশ্রাব্য সংগীতধারা নির্মাণ করেছিলেন। লৌকিক গানের সুরে আনলেন এক অসামান্য সংযম ও শক্ত সমাহিত শ্রী - গ্রাম্যতার 'edgy roughage'। দূরে সরিয়ে তার প্রাণস্পন্দনের মূল সুরটি গানে বাঁধলেন তিনি যেমন গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুস্তানী গানের ও রাগের ভাবের অনুরাগটুকু। তিনি বর্জন করেছিলেন সংগীতের যন্ত্রণাদায়ক অতিশায়ন (excess) এবং মুদ্রাদোষ (mannerism), অর্জন করেছিলেন সুর-রাগ-ছন্দের আসল সৌন্দর্য ও কাব্যবোধ। ফলশ্রুতি ঃ এক অনন্য অশ্রুতপূর্ব সৃষ্টি!

অনেকের মতে, এ ধারার গানেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ-সচ্ছল ছিলেন। এইসব গানেই রয়েছে তাঁর সংগীত রচনার সর্বোৎকৃষ্ট নজির। অলংকারহীন এই সংগীত-ধারার সুর ও কথার তাৎপর্যময় সারল্য ও সহজিয়া ভাব রবীন্দ্রসংগীতে এক অভিনব মিশ্রিত মাত্রা এনে দিয়েছে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', এই গানের সঙ্গে 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে, ও আমার একলা নিতাই,' বাউল গানটির সুর-সাদৃশ্য কানে লাগারই মতো। 'আমার সোনার বাংলা', 'যখন পড়বে না মোর পা'য়ের চিহ্ন', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', বাউল প্রকৃতির গানের অনন্যতা-অন্বিত দৃষ্টান্ত। শান্তিনিকেতনের নবনীদাস বাউলের গান তাঁর খুব ভালো লাগত - 'পৌষ মেলায়' আসা অন্যান্য বাউল-দরবেশদের যে সমাগম হত, তাদের গান শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন জীবনোপলব্ধির স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর গ্রামের মাধ্যমে, যদিও কোন কোন গবেষকের মতে, তিনি 'রাঢ় বাংলার ভৈরবী ঠাটের বাউল সুরের থেকে ভায়িটালি-ভিত্তিক শিলাইদহের গানের সুর-ই বেশি গ্রহণ করেছিলেন।'

৩) বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী কীর্তন এবং ঢপ বা ভাঙা কীর্তনের ভাব-ভাষা, সুর ও ছন্দ মিলিতভাবে রবীন্দ্রসংগীতে মূর্ত। কবিগুরুর কীর্তনাঙ্গ সুরের সৃষ্টিধর্মী সংগীত হিসেবে দুটি গানের উল্লেখ করি ঃ 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ', ও 'ঐ আসনতলে মাটির পরে ', 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে'।

৪) হিন্দুস্তানী রাগসংগীত, লোকসংগীত ও কীর্তন প্রকৃতির গান ছাড়াও, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গানের সুর এবং বিদেশের অর্থাৎ ইয়োরোপীয় সংগীত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচ্চাঙ্গ ধরনের বহু গান রচনা করে বাংলার সংগীত ভাণ্ডার ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন।

প্রয়োগনৈপুণ্যে সেসব গান খুবই শ্রুতিসুখকর। মাদ্রাজী গান 'নিতু চরণমুলের' ধাঁচে তিনি রচনা করলেন 'বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী' - তামিল সুরে আরেকটি বিখ্যাত গান 'বাজে করুণ সুরে', আরেকটি দক্ষিণী গান 'বৃন্দাবন লোলা' রূপ নিল 'নীলাঞ্জন ছায়া'। মারাঠী গান 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মা' হয়ে গেল 'বিশ্ববীণা রবে।' মহীশূরী ভজনের সুরে আমরা পেলাম 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে' ও 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।'

কেউ কি এসব গানের আদি-উৎস নিয়ে মাথা ঘামাবে, না কি, সব ভুলে গিয়ে গানগুলির ভাব-কাব্যরস মাধুর্যে ও সুরের গভীরে ডুবে গিয়ে মগ্ন-মুগ্ধ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলির উদ্দীপ্ত কথা, গম্ভীর জাতীয়তাবাদীভাব, যথোপযুক্ত হৃদয়স্পর্শী সুর-তাল-লয়-ছন্দ ভারতের জনগণকে উদ্বোধিত করেছিল। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রবাদপুরুষ এই সংগীতগুরু শুধু ব্রিটিশ শাসন ও দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হননি, তাঁর স্বদেশ-পর্যায়ের বহু গানে আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই মানব মনের সব সংকীর্ণতা ও পঙ্কিলতা, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা, সব নীচতা, হীনতা, হিংসা দ্বেষের করাল কবল থেকে মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। এখানেও কবি রবীন্দ্রনাথ সংগীতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য করেছেন গানের কাব্যিক সুর-ঋদ্ধ সৌন্দর্যের প্রাথমিক শর্ত মেনেই সংগীত-নির্মাণ করতে। একই সঙ্গে তাই এই পর্যায়ের গানে, আমরা পেয়ে যাই একদিকে শৃঙ্খল-বন্ধন মুক্তির উদাত্ত আহ্বান, ভয়-ভীতি সংকোচ-বিহ্বলতার অপমান থেকে ম্রিয়মাণ মনকে অপসারণের আবেদন, অন্যদিকে কাব্যাদর্শ ও সৌন্দর্য মাধুর্যের উচ্চমানরক্ষা, সঙ্গে অনেক সময় আধ্যাত্মিকতার নমিত ছোঁয়া, 'আমি ভয় করব না, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে', 'শুভ কর্মপথে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' ইত্যাদি কবিগুরুর স্বদেশী গান আসলে সুর-সমৃদ্ধ মানবিকতার কবিতা — যা মানুষকে ভাবায়, জাগায়, এগিয়ে চলার শপথ শোনায়, জয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। দুটি পৃথক সার্বভৌম স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত লেখার অনন্য অধিকার আর কোন সংগীতকারের প্রাপ্য ছিল বলুন। আসলে রবীন্দ্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তাঁর holistic continual' যা তাঁর সংগীতেও সমানভাবে বিধৃত।

রবীন্দ্র-নাট্য-সংগীত ঃ

সংগীত-নৃত্য-চারুকলা-সংস্কৃতিমনস্ক সারা বাঙালির সেরা সম্পদ। একদিকে অনন্য, অন্যদিকে অমূল্য। আমাদের ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছেও দেখছি, শুনছি, মঞ্চে উপস্থাপিত আশ্চর্য-মাধুর্যে ভরা গীতি-নৃত্য-নাট্যগুলি ঃ শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, কালমৃগয়া, এদের জনপ্রিয়তা আজো অটুট, অম্লান, অব্যাহত। স্কুল-কলেজ-অ্যামেচার-প্রফেশন্যাল সব গ্রুপেরই প্রথম পছন্দ রবীন্দ্রনাথ। এখানে নৃত্য তার সংগীত-নাট্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আবার সুর-মিশ্রিত সংলাপও ছোট ছোট ভাঙা-ভাঙা গান, এবং অপেরা পদ্ধতিতে তৈরি 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', কালমৃগয়া'র গানগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসেবেও অনবদ্য। এদের মধ্যেই বেশ কিছু গানে বিদেশী সুরের স্বচ্ছন্দ-স্বাভাবিক মিশ্রণ ও প্রয়োগ আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'নাট্যগীতি'ও অনিন্দ্য সৌন্দর্যে বিধৃত ও ঝংকৃত। তারা যে শুধু নাটকের পাত্র-পাত্রীর আবেগ-অনুরাগ-ভাব প্রকাশের বাহন তা নয় - নিশ্চয় তারা situational, তবু 'ব্যক্তিক হয়েও তারা হয়ে গেছে সার্বজনিক, সকলের মনের কথা, নিবেদনের বাণী, সেখানে রয়েছে নাট্যাতীত সত্য-ভাবনা। 'চিরকুমার সভা', 'তাসের দেশ' 'চার অধ্যায়'-এর গান সহজে ভোলা যায়? মজা, কৌতুক, হাসি, চটুলতা, রসিকতার সাথে সাথে কাব্যিক ভাব-গভীরতা রবীন্দ্রনাথের গানের অন্য একটি অনুপ্রেরণার দিকও আছে। অনুপ্রেরণা না বলে অনুভাবনা বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। এই অনুচিন্তন তাঁর নবনব সৃষ্টির দোসর হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাড়িতে, পিয়ানো-তে বাজানো কোন বিদেশী গানের সুর শুনে সেই মতো মনে-মনে তাঁর নিজস্ব ভাব ও কথা ভ্রমরের মতো গুণ-গুণাতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হত সংগীত। তেমনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ বা অবস্থানকালে শোনা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক গানের সুর, তাল, ছন্দে প্রাণিত হয়ে, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করেছেন বহু গান। হিন্দি ভাঙা গানের অনুসরণে কবির কয়েকটি অবিস্মরণীয় গান, মূল গানের প্রথম পংক্তি ও রাগ সহ, উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না ঃ

অন্যত্র, তামিল, মহীশূর, দক্ষিণী সুরের প্রভাব-সম্পন্ন গানের উল্লেখ করেছি।

'পুরানো সেই দিনের কথা'-র মূল পাশ্চাত্য গানটি And

রবীন্দ্রনাথ	মূলগান	রাগ
মহা বিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমন কল্যাণ
সখি, আঁধারে একলা ঘরে	সখি, আওত আঁধরী ঘটা	সিন্ধু
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদি শিবশক্তি	দীপক পঞ্চম
মহারাজ এ কী সাজে	মেরে ছন্দদল সাজে	বেহাগ
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ

Lang Syne.

রবীন্দ্রসংগীতের স্থাপত্য-ভাস্কর্য অর্থাৎ নির্মাণ বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে এই ভাগ-অনুভাগ-উপভাগের উল্লেখমাত্র। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রসংগীতকে বিশেষ-বিশেষ পোষাকের মোড়কে বেঁধে জানতে হবে, বুঝতে হবে বা ভালো লাগাতে হবে। নৈব নৈব চ। আপন সত্তায় পূর্ণ লাবণ্যময়। কথা, সুর, ভাব, অনুভূতি, জীবন-চেতনা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতি, পূজা, ঋতুরঙ্গ - বোধ ও বোধির ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে ঋদ্ধ বাংলা গানের যে অনন্য নতুন ধারার সৃষ্টি, তারই আরেক নাম রবীন্দ্রসংগীত।

সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা বলতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 'রবীন্দ্রনাথ সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রকে ব্যক্তিক করেছেন; সংগীতের বিমূর্ততাকে করেছেন মূর্ত, তিনি সুরের মানবায়ন (humanisation) ঘটিয়েছেন।' রবীন্দ্রসংগীত পৃথিবীর সংগীত ক্ষেত্রে এক অনন্য সৃষ্টি। আরো একজন সংগীত সমালোচকের মতে ঃ রবীন্দ্রনাথ অত্যুৎকৃষ্ট সুর ও অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য স্রষ্টারা মূলত যন্ত্র সংগীতের (যেমন বেহালা, অর্গ্যান, চেলো, পিয়ানোফর্টে ইত্যাদি) উপযোগী সুর রচনা করেছেন - কোন কোন স্রষ্টা নিশ্চিতভাবেই 'স্বর্গীয়' সুর নির্মাণ করেছেন যেমন মোৎসার্ট, বিঠোফেন, সেবাস্টিয়ান বাখ, ভাগনার, হাণ্ডেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্পূর্ণ অন্যরকম - তিনি তাঁর গানে বাণী ও সুরের 'যুগল সম্মিলন' ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গানের কাব্যাংশের মেজাজ ও ভাব অনুযায়ী রাগরূপ ও সুররূপ স্থির করে সেইভাবে সংগীত সৃষ্টি করেছেন, যাকে অনেকে 'অর্ধনারীশ্বর সম্পর্ক' বলে অভিহিত করেছেন।

গানে কথা আগে, না সুর — এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। কার দর বেশি, আর কার কদর - এ নিয়েও নানা মহলে মতানৈক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা, কম হলেও ছিল এবং আছে। কেননা তিনি একই সঙ্গে গীতিকার ও সুরস্রষ্টা। এই দুটি ভূমিকা একই শিল্পীর মধ্যে পাওয়া গেলে সুবিধে এই যে সে তার অনুপ্রেরণা অনুযায়ী কথা ও সুর সৃষ্টি করতে পারে — 'আগে-পরে'র বিভেদটা অতটা প্রকট হয় না। দুটোই যুগপৎ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও বহু সংগীতসৃষ্টি এভাবেই হয়েছে। (আমার বিশ্বাস, অন্যান্য সংগীতস্রষ্টারাও যেমন অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল - এই ট্রাডিশনেরই বাহক ছিলেন।) তবুও, কারো-কারো মতে, কবিগুরুর গানে সুরের চেয়ে কাব্যাংশের গুরুত্ব অনেক বেশি। আবু সৈয়দ আইয়ুব বলেছেন ঃ 'রবীন্দ্রনাথের গানে বাণীই রাজাধিরাজ'। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী-গবেষক ডঃ অনুপ ঘোষাল বলেছেন ঃ 'ভারতীয় রাগসংগীতে সুর ও শৈলীকে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কাব্যভাবানুগামী করে প্রয়োগ করেছেন, যেখানে যতটুকু মাধুর্য, তা আহরণ করে পরম যত্নে, অসামান্য বৈচিত্র্যময়তা শিল্প সৌন্দর্যে তাঁর কাব্যগীতিকে রসমণ্ডিত করে উপহার দিয়েছেন।' কথা ও সুর প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন ঃ 'কবিতার মেজাজ দেখে বোঝা যাবে সেটি কোন্ শ্রেণীর রাগরূপ ধারণ করতে সমর্থ।'

অথচ, রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন ঃ 'গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি তদাপেক্ষা উচ্চ আসন দিই .... তাহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।' গানের জীবকোষ কয়েকটি বিশেষ সুরের মিলন। এই সব দানা বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন। তাঁর মত ছিল ঃ 'যেখানে যেটুকু দরকার, ভালো শুনাবে এবং বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করবে সেখানে সেটুকু লাগাতেই হবে - তাতে কোন বিশেষ রাগ মরুক কি বাঁচুক, তা নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে না!' এখানেই রবীন্দ্রনাথ একক ও অনন্য - রবীন্দ্রসংগীত 'পণ্ডিতী' বা 'ওস্তাদী' ধারার থেকে উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র চিহ্নিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

১৩২৪-এ রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে যে মুক্তির কথা বলেছিলেন — সে হল, গানকে নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে প্রাণের সঙ্গে, হৃদয়াবেগের সঙ্গে যুক্ত করা — আর এই মুক্তি যে 'স্বেচ্ছাচার' নয়, 'স্বাধীনতা'; ঠিক তাই তিনি তাঁর সংগীতজীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে, ঘটিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত গানে, অত্যন্ত শিল্পসম্মত নৈপুণ্যে সার্থকভাবে। সংগীতের সার্থকতা প্রসঙ্গে আমাদের আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা গানের বিষয়ে দু'একটি কথা না বলে পারছি না। 'উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস'-এর পূর্বতন একটি সংখ্যায় আধুনিক গান শীর্ষক প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কথা, সুর ও কণ্ঠের ত্রিভাজন। মানে হল, আধুনিক বাংলা গান-নির্মাণের প্রক্রিয়াটি হল ঃ

১. ভাব/আবেগ/প্রাণনা → কথা/বাণী → সুর/রাগ → কণ্ঠ
↓ ↓ ↓
গীতিকার সুরকার গায়ক

২. সুর/রাগ → কথা/বাণী → কণ্ঠশিল্পী
↓ ↓ ↓
সুরশিল্পী গীতিকার গায়ক

সাধারণ নিয়মে গীতিকারের লেখা গানের উপর সুরকার সুর দেন, গায়ক দেন কণ্ঠ। কোন কোন সুরকার আছেন যাঁরা আগে সুর করে গীতিকারকে তার উপর কথা বসাতে বলেন (যদি না তিনি নিজেই গীতিকার হন — যেমন সলিল চৌধুরী,

সুমন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। রূপংকর, সুমন, নচিকেতা স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্তরা থ্রি-ইন-ওয়ান - নিজেরা গান লেখেন, সুর দেন ও গান করেন!) ষাটোর্ধ বছর, গীতিকার হিসেবে, আধুনিক বাংলা গানের জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, অতি-অধিকাংশ জনপ্রিয়তম বাংলা গান প্রথমে কথা দিয়ে সুরু হয়েছে, যেখানে কবি আপনমনের মাধুরী মিশায়ে, কাব্য ভাব প্রকাশ করে, নিজস্ব কবিতার ছন্দ-লয়ে, গানের অবয়ব তৈরি করেছেন এবং সুরকার তারপর তাতে আপন রাগরাগিনী ও সংগীত চেতনা বা সংবেদনা মিলিয়ে প্রাণ ঢেলে সুর মিশ্রণ করেছেন — আর তারো পর বাদক কণ্ঠ ঢেলে আবেগভরে কবির ভাব আর সুরকারের সুর-মাধুরী-কে সাধারণ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। লোকের মুখে মুখে গীত হয়েছে সেসব গান। আমার মনে হয়েছে সুরের কাঠামোর উপর বাণী বসালে নানাভাবেই 'ছন্দপতন' হয় - কাব্যের স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুণ্ণ হয়, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, গান artificial হয়ে পড়ে, এক কথায় গীতিকবিতার চরিত্র-স্খলন হয়। মুম্বাই-এর বিখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্র-র (পরিণীতা, লাগে রহো মুন্নাভাই', বাংলায় 'অন্তহীন'-খ্যাত) উপরোধে আমিও খ্যাতনামা দক্ষিণী-গায়িকা চিত্রার (এ.আর রহমানকৃত 'রোজা' খ্যাত) জন্য তার দেওয়া সুরের উপর গান লিখেছি - কিন্তু স্বচ্ছন্দ বোধ করিনি, লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে, কেন 'কবি-আমি' নেই তাতে। যাইহোক, মানতেই হবে, এ ব্যাপারে শেষ কথা কেউই বলতে পারবে না - নানা মুনির নানা মত, আর, যত মত তত পথ। তবে, এটুকু হলফ করেই বলা যায় যে সবাই তো রবীন্দ্রনাথ নন, নন অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা নজরুল। দু-জন বা তিনজনের প্রতিভার অস্তিত্ব ও তার পূর্ণ উন্মেষ একজনের মধ্যে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই বিরল-দুর্লভ।

আধুনিক বাংলা গান প্রসঙ্গে একটি দুটি কথা বলা নেহাৎ অপ্রাসংগিক হবে না। পুর্ব শতকের মধ্যচল্লিশ থেকে বাংলা গানের যে স্বর্ণযুগের শুরু তা সলিল চৌধুরীর মাধ্যম পেয়ে (অবশ্য সুমন, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতারা এই দলে সামিল হলেন) 'জীবনমুখী' রূপ গ্রহণ করল, (কোনও এক গাঁয়ের বধু'কে দিয়ে) আর, তাতেও কারো-কারো মন না ভরায় 'বাংলা ব্যাণ্ড'-এর গান নামে এক অদ্ভুত, কিংভূতকিমাকার, অসংলগ্ন, ভবলেশহীন, চীৎকার ও উন্মাদোপম অঙ্গভঙ্গীময় গীতধারার সৃষ্টি হল। জনপ্রিয়তাও পেলো, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়, কিন্তু বাংলা গীতিকাব্যের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য (lyrical tradition), সুর-মাধুর্য (melody), রাগ-রাগিনীর কুশলী কারুকার্য সব গোল্লায় গেল, হারিয়ে গেল মোহময় মঞ্চসজ্জার কারিকুরি (stagecraft), বিচিত্র আলোর উৎপাত (psychedeliteffect), উচ্চগ্রামের যন্ত্রানুষঙ্গ, আর গায়ক-গায়িকা-বাদক-বাদিকাদের শারীরিক কসরতের কাছে। এই দৃষ্টিগ্রাহ্য (শ্রুতি নয়) নাটকীয়তাকে বাংলা গানের অভিধা থেকে কেটে বাদ দেওয়া যৌক্তিক মনে করি। কাব্য-সুর-প্রধান বাংলা গান আজ বিলোপের মুখোমুখি। সত্যি কথা বলতে গেলে, গান লেখা খুব সহজ কাজ নয়। সব কবিতা গান নয় (জোর করে তাতে অক্ষম সুর বসালেও), আবার সব গানও কবিতা নয়। বাংলা সাহিত্যে কবির সংখ্যা তো অগুন্তি - গান লেখেন বা লিখতে পারেন ক'জন? গান লিখতে যে সংযম, গভীর গীতলতার ভাব, রাগ-রাগিনীর ও সুর বোধ, ছন্দ-যতি-লয়ের সম্যক জ্ঞান সব কবির থাকে না। তাই বুঝি, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা গীত রচনার দিকে পা-ই বাড়াল না!

রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁর কবিতার মতো, শতবর্ষ পরেও সমানভাবে সর্বজনগ্রাহ্য। আমি রবীন্দ্রসংগীতের তন্নিষ্ঠ অনুরাগী হিসেবে প্রায় রোজই 'গীতবিতান' খুলে পড়ি। আমার মনে হয়েছে, গীতবিতানের মতো কটি কাব্যগ্রন্থ বাংলা কেন, জগতসাহিত্য খুঁজলে পাওয়া যাবে? সকাল নেই, বিকেল নেই, সন্ধ্যারাত, মধ্যরাত - সব সময়ই কোন না কোন জায়গায় রবীন্দ্রসংগীত ধ্বনিত হচ্ছে - গীতবিতান তাই প্রায় নিত্যসঙ্গী আমার। অধুনা, রবীন্দ্রসংগীত এতই জনপ্রিয় যে যেকোন সংগীতশিল্পীই তার গানের album কাটতে ব্যগ্র, বাংলা দূরদর্শনের বহু serial আধুনিক গানের বদলে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করে। বাংলা সিনেমাও তাই। রবীন্দ্রনাথের আবেদন সার্বজনীন, ঘরে ঘরে মুখে মুখে প্রচারিত তাঁর গান।

কিন্তু জনপ্রিয়তার কারণেই, কি অন্য কোন বাণিজ্যিক ভাবনা ফলেই হোক রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে হাল আমলে, বিশেষ করে রবীন্দ্র সংগীতের উপর থেকে 'কপি রাইট' উঠে যাওয়ার পর থেকে, বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর টানাপোড়েন চলছে — রবীন্দ্রনাথের গানের জগতে অরাজকতার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। 'কপিরাইট' আইন অনুযায়ী, আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, লেখকের মৃত্যুর অর্ধশত বৎসর পরে তাঁর লেখার উপর তাঁর, তাঁর পরিবার বা অনুমোদিত কোন প্রকাশক বা সংস্থার সংরক্ষিত অধিকার লোপ পায় এবং সেই সাহিত্য কর্ম সাধারণের সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। ১৯৪১-এ রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর ১৯৯১-তে 'কপিরাইট' শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তদানীন্তন নরসিমহা রাও-এর কেন্দ্র সরকার আইন সংশোধন করে আরো দশ বছর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়, ফলে ২০০১-এর পর রবিঠাকুর এখন সবার। শুরু হল তাঁকে নিয়ে কাটাছেঁড়া, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে নানা ব্যভিচার। কোন সংগীতশিল্পী ('জীবনমুখী' নচিকেতা) বলল

রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়ে আমার খেয়ালখুশি মতো সুর করে গাইব। আর একজন বলল ঃ পুরোনো স্বরলিপিই অনুসরণ করতেই হবে, তার কোন যুক্তি নেই! (কেউ কেউ তার গান-এ এমন 'fusion orchestra যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহার করতে শুরু করল যে রবীন্দ্রসংগীতের মূল মেজাজ, ভাব মাধুর্য, কথার গভীরতা কোন অতলে তলিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসংগীত বাঙালি জাতির অতিপ্রিয় প্রাণের জিনিস। রবীন্দ্রসংগীত সর্বকালের আধুনিক - আমাদের খুব ভাগ্যি, আধুনিক হবার জন্য রবীন্দ্রনাথে তথাকথিত 'জীবনমুখী গানের বাস্তবতার' রূঢ়তা ও উচ্চকণ্ঠ উন্মাদনা এবং 'বাংলা ব্যান্ডে'র উৎকট উন্মাদপনা নেই। তাঁর গানে আছে শান্ত সমাহিত মাধুর্যের অনন্ত ঐশ্বর্য যা সর্বজনের সর্বকালের।

এই রাজাধিরাজই একদিন রানী চন্দকে (মজা করে, না কি একজন সংস্কৃতিবান সভ্য মানুষের স্বভাবসুলভ বিনয় ভরে!) বলেছিলেন ঃ

'এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি। জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি আমি। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে বলতে পারি না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান - এটা জোর দিয়ে বলতে পারি!' এই সত্যদ্রষ্টা মহাঋষি মানুষটি ঠিক কথাই বলেছেন - গানই তাঁকে চির-অবিনশ্বরতা দেবে।

কত গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে ঐক্যমত নেই। সুনীল বলছে, আড়াই হাজার (২৫০০), শঙ্খ বলছে ঃ ২২৫০, আমি নিজে একটি একটি করে 'গীতবিতান' গুনে পেয়েছি ঃ ২২৪৩। শুধু কি লিখেছেন? এতগুলি গানের সুর করেননি? এবং প্রত্যেকটি সুর 'ভুবনমন মোহিনী' নয়? চোখ বুঁজে, চুপ করে একটুখানি ভাবলে তাঁর সংগীত প্রতিভার পুরোটা নয়, কিছুটা অন্তত আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেক গান ভৈরবী-তে বেঁধেছিলেন কিন্তু তার প্রকাশ কোন বাধা পথ ধরে চলেনি। তাই তাঁর ভৈরবীও একটু অন্যপথে গেছে। — সোমেন্দ্রনাথঠাকুর একে আখ্যা দিয়েছেন 'রাবীন্দ্রীভৈরবী'। এই নবসৃষ্ট রাগে রচিত কয়েকটি গান ঃ 'আমি চঞ্চল হে', 'একটুকু ছোঁয়া লাগে', 'এতদিন যে বসে ছিলেম', 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে', 'হে ক্ষণিকের অতিথি' প্রভৃতি।

শেষ করার আগে একটি খুবই সংক্ষিপ্ত গীত-সূচি তাঁর অজস্র মনমাতানো গানের ভাণ্ডার থেকে বেছে নিয়ে, পেশ করছি, যার থেকে স্পষ্ট হবে, রবীন্দ্রনাথের শারীরিক বয়স তাঁর সংগীতের সৃজনশীলতাকে বিন্দুমাত্রও ম্লান করতে পারেনি।

১) বলি ও আমার গোলাপ বালা (বেহাগ) (১৭)
২) সখী ভাবনা কাহারে বলে (বেহাগ খাম্বাজ) (১৯)
৩) ওই জানালার ধারে বসে আছে (মিশ্রখাম্বাজ) (২২)
৪) আজি শরত তপনে (যোগিয়া) (২৫)
৫) এমন দিনে তারে বলা যায় (দেশ মল্লার) (২৮)
৬) আমি চিনি গো চিনি তোমারে (৩৪)
৭) কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি (কীর্তন) (৩৯)
৮) যদি তোর ডাক শুনে কেউ (বাউল) (৪৪)
৯) আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার (সিন্ধু) (৪৮)
১০) যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন (বাউল) (৫৪)
১১) আকাশ ভরা সূর্যতারা (কেদারা) (৬৩)
১২) মায়াবন বিহারিণী হরিণী (ইমনকল্যাণ) (৭৩)
১৩) চক্ষে আমার তৃষ্ণা (সারং মল্লার কানাড়া) (৭২)
১৪) যে ছিলো আমার স্বপনচারিণী (কীর্তন) (৭৭)
১৫) বাদল দিনের প্রথম কদমফুল (মেঘমল্লার) (৭৮)
১৬) সম্মুখে শান্তি পারাবার (ইমন পূরবী) (৭৮)
১৭) হে নূতন, দেখা দিক আরবার (ভৈরবী) (৮০)

রাগরাগিনীর বিস্ময়কর পারদর্শিতা ও জ্ঞান এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবহার মূলত একজন কবির পক্ষে অভাবনীয়।)

৮০ বছর বয়েসে, তাঁর মহাপ্রয়াণের বছরে, 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'কে নতুন করে দেখা দেবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গান লিখলেন। কী বিস্ময়কর তাঁর ভবিষ্যৎ-দর্শন, গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার নিহিত দ্যোতনা! শেষ দিন পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ আপন সাংগীতিক প্রতিভার নব নব সৃষ্টিশীলতায় 'সংগীত রচনার অনেকপ্রচল লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ নতুন সাংগীতিক প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন' বলেছেন বুদ্ধদেব বসু। ভাষা দিয়ে তিনি ভাষাতীতকে রূপবদ্ধ করে গেছেন, অসীমকে সীমায় ধরেছেন যে-সীমা আবার অসীমে মিলিয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় সংগীতশিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী প্রশ্নোত্তরে বললেন ঃ

'গান শুধু কথা নয়, সুর নয়, গান হল প্রাণ। যে গানে প্রাণ নেই, ভালো-ভালো কথা ও সুর থাকলেও তা প্রাণস্পর্শ করবে না। রবীন্দ্রসংগীতে প্রাণই আসল। গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।'

দিনের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকা তারার মতো গীতবিতানের সব কবিতায় নিহিত রয়েছে গোপন-মধুর অশ্রুত সুর - যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'অগীত সংগীত।'

সারা বিশ্বের সমগ্র বাঙালি জাতি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের কৃপাধন্য তারা রবীন্দ্রনাথকে প্রাণের পুরুষ হিসেবে পেয়েছে। তাঁর গীত ও অগীত সংগীতে মগ্ন, মুগ্ধ ও ঋদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে। যার রবীন্দ্রনাথ আছে, তার আর কি চাই? ❑

লেখক একজন আমলা, কবি ও নামী প্রবন্ধকার